যা ছিল তার একলার গান

নানা ধরনের গানের জন্য কিশোরকুমার বিখ্যাত ছিলেন। এক মুহূর্তে তিনি আসর জমিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু যখন তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন তখন ছিল তার অন্যরকম চেহারা। এই গান গাইতেন নিজের তাগিদ থেকে—প্রেরণা আসতো অন্তর। ভেতর থেকে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মতো। এই গান ছিল তাঁর অর্চনার উপকরণ, তাঁর প্রেমের প্রতীক।

কয়েক বছর আগেই নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে কিশোরকুমারের গানের আসর। তাঁর সঙ্গে সেবার গান করেছিলেন ঊষা উত্থুপ, রুনা লায়লা। সেই সন্ধ্যার সবিশেষ আকর্ষণ কিশোরকুমার এলেন সবশেষে। সমস্ত স্টেডিয়ামে যেন তখন সমুদ্র-মন্থন পালা চলছে। তার সঙ্গেই ভারসাম্য রেখেছিলেন কিশোরকুমার। তাঁর গানের নির্বাচনে, পরিবেশনে যেন কেবলি তরঙ্গ উঠতে লাগল। পঞ্চাশ বছর বয়সের শিল্পী হাত-পা ছুঁড়ে, নেচেকুঁদে, হৈহল্লা করে তাঁর গানগুলি গাইতে লাগলেন যেগুলি তাঁর জনপ্রিয়তা এবং ঐশ্বর্যের উৎস। জনা পঞ্চাশেক যন্ত্রী জমকালো পোশাক পরে সেইসব উদ্দাম সুরে বিশাল স্টেডিয়ামকে কম্পিত এবং বিপুল জনতাকে বাধিত করতে লাগলেন। প্রদর্শন-বৃত্তির প্রখর পরিচয়ে নিশ্চয় আমরা সেই কালে আপ্লুত হয়েছিলাম। হঠাৎ কিশোরকুমার মাইকে ঘোষণা করলেন, 'এবার সব বাজনা থামাও। অলোকবাবু, আপনারা আসুন।' তারপরেই স্টেডিয়ামের দিকে ঘুরেফিরে হাত জোড় করে বললেন, 'এবার আর কোনো অনুরোধ করবেন না। আপনারা সকলে চুপ করে দয়া করে শুনবেন। এবার আমি আমার মতো করে গুরুদেবের একটি গান গাইব। আপনারা সুর ধরুন।' বাঁশিতে সুর ধরলেন অলোকনাথ দে, সঙ্গে এস্রাজে নির্মল বিশ্বাস, মন্দিরা ছিল রবিন গাঙ্গুলির হাতে। সেই জমজমাট যন্ত্রীরা একধারে সরে দাঁড়ালেন। কিশোরকুমার গান ধরলেন, 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান।' রবীন্দ্রনাথের সেই গান যেন ঝড়ের পরে স্নিগ্ধ বর্ষণ। যেন দীর্ঘ রৌদ্ররুক্ষ ভ্রমণের পর রম্য ছায়াশ্রয়। এক শ্রদ্ধা সেই শিল্পীর সমস্ত চোখ মুখ এবং কণ্ঠকে অধিকার করল। রবীন্দ্রনাথের গানের এমন ভূমিকা আগে যেন দেখিনি।

কিশোরকুমারের কণ্ঠ ছিল অশিক্ষিত পটুত্বের সর্বোত্তম উদাহরণ। কোনো ধ্রুপদী রেওয়াজ ছাড়াই কণ্ঠের এমন তিন সপ্তকে চলাচল আর কার ছিল জানি না। বাংলা উচ্চারণেও কোনো বিকৃতি ছিল না, স্বরক্ষেপে দারুণভাবে দক্ষ। এমন কণ্ঠের জন্যই রবীন্দ্রনাথের গান অনেককাল অপেক্ষা করতে পারে।

সত্যজিৎ রায় যখন 'চারুলতা'র জন্য, আরও পরে 'ঘরে বাইরে' ছবির জন্য নেপথ্যগায়ক কিশোরকুমারকে নির্বাচন করেন তখন বঙ্গীয় শ্রোতাদের অনেকের ভ্রূকুঞ্চন হয়েছিল। রবীন্দ্রসংগীতের এক নবীনা শিল্পীর মন্তব্য ছিল, গলায় গায়কী নেই। এবং রবীন্দ্রনাথের গানের জনৈক পণ্ডিতম্মন্য বোদ্ধা-অধ্যাপক লিখেই ফেলেছিলেন যে, সত্যজিৎ রায়ও কীভাবে কিশোরকুমারকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীত করাচ্ছেন! এই দুই ধরনের অর্ধশিক্ষিত শ্রোতার তুলনায় সত্যজিৎ রায়ের গানের শ্রবণশক্তি কিছুপরিমাণে 'ট্রেন্ড' ছিল। সেখানেই শেষ হয়নি ঘটনাটি। 'চারুলতা'য় 'আমি' চিনি গো

কিশোরকুমার

গান রেকর্ড করছেন কিশোর ও ইলা বসু

'দুষ্টু প্রজাপতি' ছবিতে কিশোরকুমার

দ্বৈতকণ্ঠে গাইছেন কিশোরকুমার ও মাধবী মুখার্জি

চিনি তোমারে' গানটির জন্য সত্যজিৎ রায় অতীব সংগত কারণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপিই মোটামুটি অনুসরণ করেছিলেন। বহু পরে যখন সেই গান কিশোরকুমার আবার রেকর্ড করতে গেলেন তখন ট্রেনারের কাছে নাকি শুনতে হল, ঐ সুর চলবে না, বিশ্বভারতী প্রকাশিত স্বরলিপিগ্রন্থে মুদ্রিত সুরই গাইতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের গানেও কিশোরকুমারের কোনো ট্রেনিং ছিল না। তাঁর পশ্চাদপটে ব্রাহ্মসমাজ কিংবা শান্তিনিকেতনের কোনো উজ্জ্বল বলয় ছিল না। অথচ, প্রতিষ্ঠান-বর্হির্ভূত এই একজন শিল্পী যিনি রবীন্দ্রনাথের গানে যথার্থ পুরুষকণ্ঠের সৌজন্য আনতে পেরেছিলেন।

একটা কিংবদন্তীর যুগ চলে গেল—বি আর চোপড়া

"আমি চিরটাকালই বলে এসেছি যে মুকেশ আর কিশোরকুমার আসার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন একটা যুগ শুরু হয়েছিল। জীবদ্দশায় দু-জনেই লেজেন্ড বা কিংবদন্তীর মতো। কিশোর যেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজত্ব করে গেল। এমন কি তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর স্বর্গকণ্ঠ মানুষের কানকে তৃপ্তি দিতে থাকবে আমি এ-ব্যাপারে নিশ্চিত। এখন কিশোর নেই, একটা কিংবদন্তীর যুগ চলে গেল, এ-ছাড়া আর আমি কীইবা বলতে পারি। ওর জায়গায় কাউকে বসানো বা ওর অনুকরণে কাউকে তৈরি করা অসম্ভব। ওর প্রতিদ্বন্দ্বিদের তুলনায় যে-গুণ ওকে সবার উঁচুতে বসিয়েছিল তা হল, গানের মুড এবং টেম্পোর অনুযায়ী নিজেকে পাল্টে নিতে পারত, এটাই ওর স্বাতন্ত্র্য। আর কত অনায়াসে ওটা ও করতে পারত। ও যেন কণ্ঠে রক্ত, অথবা নিঃশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারত বলা যায়—।" আমার মনে হয় ও যেদিন থেকে শিমিক বা চমকের দিকে ঝুঁকল, সেই দিন থেকেই ওর মধ্যে যে অভিনেতাটি ছিল সেটা হারিয়ে যেতে শুরু করল। আর ওই কারণেই ওর নিজের ছবি ছাড়া ও আর অভিনয় করত না।

কৃষ্ণ

অনায়াস অধিকার যেন তাঁর ছিল এই গানে। কী সহজেই গানটিকে মুঠোর মধ্যে ধরতেন, ধীরভাবে তাকে ছড়িয়ে দিতেন তারপর। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে এক সরল ভঙ্গিমা আছে, তাকে মনে হয় যেন কথা বলার মতই সরল ; অথচ লয়তে, মাত্রাভাগে, উচ্চারণের সঠিক স্থাপনায় এবং সর্বোপরি সেই গানের গভীর, গভীরতম এক সংবাদ বহনে তার মধ্যে জটিলতা গোপন হয়ে থাকে। কিশোরকুমারের উজ্জ্বলন্ত কণ্ঠ তাকে আবিষ্কার করেছিল। কোথায় স্বরচ্যুতি হয়নি, কখনো নাটকীয়তা আরোপ করেননি, প্রখ্যাত বঙ্গীয় শিল্পীদের মত ট্রেমেলো বা স্বরকম্পনও সরবরাহ করেননি। মীড়ের ব্যবহারে কিশোরের কণ্ঠ ছিল নিখুঁত : 'হায়, কাহার পথে বাহির হলে বিরহিনী' এই পংক্তিতে গান্ধার থেকে তারসপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন সংযত মীড়ের প্রয়োগে কী আয়াসহীন গতিতে প্রশ্নটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত কিশোরকুমারের কণ্ঠে ! 'সঘন গহন রাত্রি' গানটি তাবড় সব গুণী শিল্পীরা শুনিয়েছেন আমাদের, কিন্তু বলতেই হয়, কিশোরকুমার এমন সব স্বর সেখানে প্রয়োগ করেছেন যেগুলি শুধু স্বরলিপিতেই অনেককাল বন্ধ ছিল। এমন প্রবল মধুর কণ্ঠ এখন রবীন্দ্রনাথের গানের জগতে দুর্লভ। কিন্তু, রেকর্ডে তাঁর নিচু স্কেলে গান মনে হয় ট্রেনারের সুবিধার্থে, নির্বাচনেও সেই রীতি সুবিধেজনকভাবেই নেওয়া হয়েছে ; উঁচু স্কেলে বাঁধলে রবীন্দ্রনাথের গান কিশোরের কণ্ঠে কীরকম জ্যান্ত হয়ে ওঠে তার প্রমাণ সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে পাওয়া গেল। আর রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কী ? শান্তিনিকেতন এবং ব্রাহ্মসমাজের বাইরে আর কোনো পুরুষকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানের সেই স্বভাবটি স্পষ্ট হয়নি। সেদিকে কিশোরকুমারকে একতমের সম্মান দিতেই হয়।

এবং একটি অনির্দেশ্য শ্রদ্ধা কিশোরকুমারের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানকে ঘিরে রেখেছিল। শুনলেই সেই সিনসিয়ারিটি এবং গম্ভীর ধ্যানের ভাবটি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। কোনো যশ বা অর্থের জন্য নয়, কোনো ফ্যাশন বা ডিগনিটির তরেও নয়, রবীন্দ্রনাথের গান যেন কিশোরকুমারের কণ্ঠ আর গায়নরীতিকে এক গহন বিষাদে ভরে রেখেছিল। এ যেন তাঁর একলার গান, একা মনের গান, তাঁর অর্চনার উপকরণ, তাঁর প্রেমের প্রতীক। সেইজন্যই যখনই শুনি তাঁর কণ্ঠে, 'তোমার সভায় যবে করব অবসান। এই কদিনের শুধু এই কটিমোর তান' তখন এক পরিচিত বেদনাই দ্বিগুণতর হয়ে আসে। যদিও জানি তারপরে আছে 'এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান, ভুলতে সেকি পার'—আমরা জানি না এই চরম গরিমার উত্তরে কবি কী বলতেন ! কিন্তু আমরা এই প্রশ্নের উত্তর জানি।

পার্থ বসু